অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

প্রকাশ্য বিবৃতি

৩ জানুয়ারি ২০১৮

সূচক: এএসএ ১৩/৭৬৬৯/২০১৮

বাংলাদেশঃ আদিবাসী মানবাধিকার রক্ষাকারী মিঠুন চাকমা'র হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে একটি সপূর্ণ তদন্ত করুন

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আদিবাসী মানবাধিকার রক্ষাকর্মী মিঠুন চাকমাকে হত্যার ঘটনায় দেরী না করে যথাযথ তদন্তের জন্য বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছে এবং বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে এটাও নিশ্চিত করতে আহ্বান জানাচ্ছে যে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তবে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যেন বিচার করা হয়।

যখন মিঠুন আদালতে নির্ধারিত উপস্থিতি সেরে বাড়ি ফিরছিল ৩রা জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে, তখন খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলায় তাকে মারাত্মকভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়।

মিঠুন পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন আদিবাসী অধিকার প্রচারক ছিলেন, যিনি আদিবাসীদের মানাবাধিকার লঙঘনের বিরুদ্ধে কথা বলতেন এবং মানাবাধিকার লঙঘনের বিরুদ্ধে একজন কঠোর সমালোচক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ২০১৬ সালের ১২ জুলাই তারিখে তাকে বিনা অভিযোগে আটক করা হয়, এবং তিনি ১৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে জামিনে মুক্ত না হওয়ার আগ পর্যন্ত তিন মাসের অধিক সময় ধরে আটক অবস্থায় ছিলেন।

তার মুক্তির পর মিঠুনকে তার বিরুদ্ধে আরও ১০ টি ফৌজদারি মামলা সম্পর্কে জানানো হয়। এই মামলাগুলোর কিছু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (আইসিটি) ২০০৬ এর অধীনে আনা

হয়েছিল, যা মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের অযৌক্তিক সীমাবদ্ধতাকে অনুমোদন করে, উদাহরণস্বরূপ, সরকারী সংস্থাগুলোর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সামাজিক গণমাধ্যমে আলোচনা সীমিত করা।মিঠুনের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (আইসিটি) ২০০৬ আইনের মামলায় তার অনলাইন কর্মকাণ্ড, যেমন প্রকাশিত নিবন্ধ এবং টুইট এর স্ক্রিনশট ইত্যাদি প্রমান হিসাবে দেখানো হয়েছে।

অন্যান্য অভিযোগগুলোর মধ্যে, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ, পার্বত্য অঞ্চলের চরমপন্থী সংগঠনগুলোকে সহিংস কর্মকাণ্ডে উসকে দেওয়া, এই অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা এবং অবৈধ সমাবেশ করার মত অভিযোগে মিঠুনকে অভিযুক্ত করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য অভিযোগগুলো যেমন, গাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের হুমকি ও আহত করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মিঠুন এই অভিযোগের বিরোধিতা করেছিলেন, যার বেশিরভাগ অভিযোগই সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়নি। কোন ক্ষেত্রেই মিঠুনের হত্যাকাণ্ডের আগে পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি।

মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মিঠুনকে নিয়মিত আদালতে উপস্থিত হতে হোত, যা তার আদিবাসী অধিকার প্রচারণা চালানোর ক্ষমতা সীমিত করেছিল।

অ্যামনেস্টি উদ্বিগ্ন এই কারণে যে এই ধরনের ঘটনা এমন পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখে যেখানে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কথা বলতে ভয় পায়। মিঠুনের হত্যাকাণ্ড এই উদ্বেগকে যথার্থতা দেয় যে বাংলাদেশে মানাবাধিকার রক্ষাকর্মীরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০১৭ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য এই ক্রমবর্ধমান হুমকির বিষয়ে জানিয়েছেঃ ভীতি ও দমনের মধ্য আটকে পরাঃ বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত।[1]

[1] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ভীতি ও দমনের মধ্য আটকে পরাঃ বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত (সূচক: এএসএ ১৩/৬১১৪/২০১৭)

প্রতিবেদনটি এটা দেখতে পেয়েছে যে, ২০১৩ সাল থেকে আদিবাসী ও ধর্মনিরপেক্ষ কর্মীদের উপর বেশ কয়েকটি মারাত্মক ও প্রায় মারাত্মক আক্রমণ হয়েছে।

একের পর এক এই সহিংসতা নিয়ে বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া ছিল বেশ সমস্যাযুক্ত। বেশ কিছু ক্ষেত্রে, অপরাধীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় নি এবং এমন কি ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাগণও হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেক কর্মী যারা মৃত্যুর হুমকি পাওয়ার পর পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছিলো, তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো। উদাহরণস্বরূপ, যখন ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগার নিলয় নীল খুন হওয়ার কয়েক দিন আগে পুলিশের কাছে সুরক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিল, তখন পুলিশ তাকে সুরক্ষা দেয়ার কোন বন্দোবস্তই করেনি।

২০১৬ সালের অক্টোবরে মিঠুনের আটকাদেশ আইসিটি আইনের ধারা ৫৭ -এর অধীনে প্রদান করা হয়। এই ধারা ৫৭ সেই সব ব্যাক্তিকে অপরাধী করে যারা আইন-শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যাকারী কোন উপাদান বা রাষ্ট্রের ইমেজকে ক্ষুণ্ন করে বা ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে এমন কোন উপাদান ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশ করে।

এই অপরাধের জন্য শাস্তি পূর্বে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাবাস ছিল। যাইহোক, ২০১৩ সালে একটি সংশোধনী এই সম্ভাব্য শাস্তি বৃদ্ধি করে ১৪ বছর করা হয়। এই সংশোধনীতে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতারের অনুমতি দেওয়া হয়, যেমনটি হয়েছিলো মিঠুনের ক্ষেত্রে।

অ্যামনেস্টি এ বিষয়ে সচেতন যে সরকার আইসিটি আইনের ধারা ৫৭ বাতিল করার জন্য চিন্তাভাবনা করছে এবং পরিবর্তে একটি নতুন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট প্রবর্তন করতে চাচ্ছে। যাইহোক, এ ক্ষেত্রেও উদ্বেগের বিষয় এই যে এই আইনে খসড়ায় কর্তৃপক্ষ মত প্রকাশের স্বাধীনতা –কে অপরাধ হিসাবে গণ্য করে শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

ভীতি ও দমনের মধ্য আটকে পরাঃ বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত – এই প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের আহ্বান জানাচ্ছে যাতে তারা যেন সেই সকল আইন বাতিল করে, যা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা লঙঘন করে এবং আইন হিসাবে গ্রহণের জন্য বর্তমানে

বিবেচিত বিলগুলি যেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য করে যেন সংশোধিত করা হয়।

পটভূমিঃ

মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে বাংলাদেশের একটি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির (ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস) যেখানে বাংলাদেশ একটি স্বাক্ষরকারী দেশ, তার ১৯ অনুচ্ছেদে বলা রয়েছে যে, কোন ব্যক্তির যে কোনও মাধ্যমের মাধ্যমে, সীমান্তের সীমারেখা নির্বিশেষে সব ধরণের তথ্য চাওয়া, পাওয়া ও পরিলক্ষিত করার অধিকার আছে।

এই অধিকার পালনের উপর কোনও বিধিনিষেধ তখনই সম্ভব যদি কেবল আইন দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এবং নির্দিষ্ট জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে (জাতীয় নিরাপত্তা, জনাদেশ, বা জনস্বাস্থ্য বা নৈতিক নীতি) বা অন্যদের অধিকার বা সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে জরুরী এবং সমানুপাতিক বলে বিবেচিত হয়।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রাথমিক প্রতিবেদনের সমাপ্তি পর্যবেক্ষণে,[2] বাংলাদেশে ব্লগারদের এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের অভিমত, মত প্রকাশের অধিকার ও সংগঠিত হবার স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগের বিষয়ে সীমাবদ্ধতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বিশেষ করে, তারা "পুলিশ কর্তৃক সাংবাদিক, ব্লগার এবং মানাবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা প্রদান, অভিযোগের নিবন্ধীকরণ, তদন্ত এবং 'চরমপন্থী দলগুলো' কর্তৃক "ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগারদের" হিংস্র হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলির বিচারের অভাব এবং সেই সাথে মৃত্যুর হুমকি, শারীরিক হামলা, ভীতি প্রদর্শন এবং হয়রানি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।"[3]

[2] জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি, বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রাথমিক প্রতিবেদনের সমাপ্তি পর্যবেক্ষণ ২০১৭।

[3] একই। অনুচ্ছেদ ২৭। (ক)

এই কমিটি ২০১৬ সালে, 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের (আইসিটি) (২০১৩ সালে সংশোধিত) অধীনে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের গ্রেফতারের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে, যা আসলে একটি ব্লাসফেমি আইন যা অস্পষ্ট ও অত্যধিক পরিভাষা ব্যবহার করে মত প্রকাশ কে অনলাইনে প্রকাশ করাকে অপরাধ বলে গণ্য করে, যা, "ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগা" এবং "রাষ্ট্রের ইমেজকে কলুষিত" করার জন্য ৭ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত কারাবাসের বিধান দেয়'।[4]

এই কমিটি ব্লগার এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের অধিকার রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুপারিশ করে।

যেসব বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে বেআইনী হত্যাকাণ্ড থেকে সুরক্ষা, শারীরিক আক্রমণ এবং হয়রানি থেকে সুরক্ষা; মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা সম্পর্কে পুলিশ ও কর্মকর্তারা যাতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার নিশ্চিত করা; অভিযোগ নিবন্ধন এবং সকল আক্রমণগুলোর যথাযথ তদন্ত করা, শারীরিক সততা এবং ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করা, অপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করা এবং যথাযথ প্রতিকারের বিধানের কথা রয়েছে।[5]

কমিটি এও সুপারিশ করে যে আইসিটি আইনের মতো আইনগুলি বাতিল বা সংশোধন করা যাতে এই আইনগুলো নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বিশেষ করে, কমিটি এই উল্লেখ করে যে, বাংলাদেশকে অবশ্যই এই আইনগুলির মূল শর্তগুলির "অস্পষ্ট, বিস্তৃত এবং উন্মুক্ত সংজ্ঞাটিকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে এবং এটা নিশ্চিত করবে যে, এই আইনগুলো যেন আন্তর্জাতিক চুক্তিটির ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের সঙ্কীর্ণ বিধিনিষেধের বাইরে যেন মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে ব্যবহার করা না হয়"।[6]

[4] একই। অনুচ্ছেদ ২৭। (খ)

[5]একই। অনুচ্ছেদ ২৮। (ক)

[6]একই। অনুচ্ছেদ ২৮। (খ)